Vol-7, No.-1, May 2016PANCHAKOTesSAYSISSN : 0976-4968

মানভূমের কথ্য বাংলা ভাষা

- অর্পিতা দাস[৩১]

মানুষের ভাব প্রকাশের প্রধান মাধ্যম হল ভাষা। এই ভাষা স্থান ও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সতত পরিবর্তনশীল। কোনো একটি ভাষা ব্যবহারকারী জন-মানুষের সংখ্যা বেশি হলে বা তা বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রচলিত থাকলে এক অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের মানুষের ভাষারীতিগত ও উচ্চারণরীতিগত বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবীর সব উন্নত ভাষার ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। সঙ্গত কারণেই ভাষাতাত্ত্বিকেরা কোনো ভাষা বিশ্লেষণের সময় মূল ভাষার সঙ্গে সেই ভাষার আঞ্চলিক রূপগুলিকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেন এবং কোনো একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

এপার বাংলা ওপার বাংলা মিলিয়ে বিস্তৃত একটা এলাকার বিপুল সংখ্যক নর-নারী বাংলা ভাষায় নিজেদের দৈনন্দিন কাজকর্ম থেকে শুরু করে তাদের ভালোলাগা, খারাপলাগা, হাসি-কান্না প্রভৃতি সকল প্রকার অনুভূতিকে প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য, সুবিস্তৃত এই অঞ্চলের সকল মানুষের উচ্চারণরীতি ও ভাষা প্রয়োগের ধরন-ধারণ সম্পূর্ণ একই রকমের নয়। তা অনেকক্ষেত্রেই আঞ্চলিক ও স্বতন্ত্র এক-একটা ঠাট অবলম্বন করেছে। এই ভাষাছাঁদকে ভাষাতাত্ত্বিকেরা উপভাষা নামে অভিহিত করেছেন। বাংলা কথ্য ভাষার পাঁচটি আঞ্চলিক রূপ উপভাষারূপে স্বীকৃত ---- রাঢ়ি, বঙ্গালি, বরেন্দ্রি, কামরূপি ও ঝাড়খণ্ডি। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, একই অঞ্চলের উপভাষার মধ্যেও বহু বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায় যাকে বিভাষা বলে। এক্ষেত্রে সামাজিক স্তরবিন্যাসের কথা বলতেই হয়। ইতর-ভদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, শ্রমজীবী-কৃষিজীবী, নারী-পুরুষ প্রমুখের ভাষারীতি ও উচ্চারণের বিচিত্র রূপ স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষীভূত হয়। ধ্বনিগত, রূপগত এবং উচ্চারণগত বিশিষ্টতা ও পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, প্রত্যেক ভাষারই একটি সাধারণ কাঠামো আছে। একই কাঠামোর মধ্যে থাকলে তবেই তা উপভাষা হিসাবে গণ্য হয়। কিন্তু পার্থক্য খুব বেশি হলে তাকে আর মূল ভাষার উপভাষা বলা যায় না। তখন তা স্বতন্ত্র ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বাংলা ও অসমিয়ার কথা বলা যায়। একটা সময় পর্যন্ত অসমিয়া বাংলার উপভাষা ছিল। কিন্তু এদের পার্থক্য বেড়ে যাওয়ায় অসমিয়া আলাদা ভাষার মর্যাদা পায়। মূল ভাষার সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষাগুলির দূরত্ব বেড়ে যাওয়ার পিছনে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ঐতিহাসিক অনেক কারণ থাকতে পারে। সেসব কিছুর বিস্তৃত আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

কথ্য বাংলার পাঁচটি উপভাষার মধ্যে ঝাড়খণ্ড লাগোয়া পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা (পুরুলিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়া, দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুর), ধলভূম, সিংভূমের (এগুলির অধিকাংশই বর্তমানে ঝাড়খণ্ডে অবস্থিত) বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ঝাড়খণ্ডি উপভাষা প্রচলিত। একটা সময় পর্যন্ত এই উপভাষার কোনো সাধারণ নাম ছিল না। তাই তা কোথাও ধলভুঁইয়া, কোথাও বাঁকড়ি আবার কোথাও মানভুঁইয়া নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানে ধলভুঁইয়া, বাঁকড়ি, মানভুঁইয়া প্রভৃতিকে একত্রে ঝাড়খণ্ডি বলা হয়। বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক সুধীরকুমার করণ অবশ্য এগুলিকে 'সীমান্ত

[৩১]অধ্যাপিকা, পঞ্চকোট মহাবিদ্যালয়, পুরুলিয়া।

Vol-7, No.-1, May 2016PANCHAKOTesSAYSISSN : 0976-4968

রাঢ়ী' ভাষাগুচ্ছ বলে চিহ্নিত করেছেন --- *''প্রকৃতপক্ষে সীমান্ত রাঢ়ের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লোকভাষার তেমন কোনো নামই ছিল না, যদিও লোকনিরুক্তিতে তা কোথাও মানভুঁইয়া, কোথাও ধলভুঁইয়া, কোথাও বাঁকড়ি ইত্যাদি নামে চিহ্নিত হত। কিন্তু এসব আঞ্চলিক ভাষাই একত্রভাবে 'সীমান্তরাঢ়ী' ভাষাগুচ্ছেরই অন্তর্গত ঝাড়খণ্ডীও এই পর্যায়ভুক্ত। 'সীমান্তরাঢ়ী' মুখ্যত মানভূমকেন্দ্রিক, বিভিন্ন অঞ্চলে ধ্বনিগত কিছু কিছু পার্থক্য অবশ্যই বর্তমান।''* (১)

আসলে পূর্বতন মানভূম জেলা ও তৎসংলগ্ন মালভূমি অঞ্চলের বাংলা ভাষাগুচ্ছকে কেউ 'সীমান্তরাঢ়ী', কেউ 'ঝাড়খণ্ডি', কেউ বা 'মানভূমি' ইত্যাদি নামে অভিহিত করে থাকেন। পুরুলিয়া জেলায় প্রচলিত মানুষের কথ্য ভাষাকেই আমরা সাধারণভাবে 'মানভূমি' বলে চিহ্নিত করেছি এবং তার স্বরূপ বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছি। মানভূমি বাংলার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে আমরা সূত্রাকারে সাজাতে পারি ---

(১) মানভূমি কথ্য বাংলায় অনুনাসিক স্বরধ্বনি খুব বেশি করে ব্যবহৃত হয়। যেমন - চাঁ, আঁটা, আঁখ, কুঁয়াঁ, উঁট, হাঁতি, হাঁতে, খাঁইয়ে, হঁইয়েছে ইত্যাদি। দৃষ্টান্ত - *'রাজার লক দৌড়ল অজগ্‌গর সাঁপ টুঁ ইড়তে।'* (২)

(২) শব্দের আদিতে অবস্থিত 'ও' কার অনেক সময়-ই 'অ'-কারে পরিণত হয়। উদাহরণ হিসাবে চোর>চর, লোক>লক, রোগা>রগা, বোকা>বকা, দোকানি>দকানি ইত্যাদির কথা বলা যায়। যেমন - *''আইজ কেনে হামাদের উপেন / মারা পড়ে রগে শকে?''* (৩)

(৩) মহাপ্রাণতা অর্থাৎ অল্পপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণ রূপে উচ্চারিত হওয়ার প্রবণতা মানভূমি কথ্য বাংলার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সুধীরকুমার করণ কলকাতার দি এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত 'সীমান্তরাঢ়ী ও ঝাড়খণ্ডী বাঙলার গ্রামীণ শব্দকোষ' গ্রন্থের 'ভূমিকা' অংশে এই বিষয়টির দিকে আলোকপাত করেছেন --- *''মানভূম কেন্দ্রিক সীমান্তরাঢ়ীতে মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রাচুর্য একটি উল্লেখযোগ্য ভাষাতাত্ত্বিক বিষয়।''* (৪) মহাপ্রাণতার কয়েকটি উদাহরণ এখানে দেওয়া হল ---- পতাকা > ফৎকা, দূর > ধূর, বুড়া > বুড়হা, গাড়া (গর্ত) > গাঢ়হা ইত্যাদি। যেমন - (১) *''কন এক গাঁয়ে এক বুঢ়া আর এক বুঢ়ী থা ইকথা।''* (৫) (২) *''উইঠে দাঁড়হা ছাড়ো ভয় / টানাটানি করবেক আরহই।''* (৬)

(৪) শব্দের আদিতে 'হ' যুক্ত ধ্বনি প্রায়শই ব্যবহৃত হয়। যেমন - আমরা > হামরা, আমাকে > হামাকে ইত্যাদি। যেমন - *''হামরা মানভূঞা বঠি।''* (৭)

(৫) ক্রিয়াপদের মধ্যে অবস্থিত হ্রস্ব 'ই' মান্য বাংলায় অপিনিহিতির প্রভাবে অনেক সময় 'এ'কারে পরিণত হয়। মানভূমের ভাষায় তা ক্ষীণ রূপ লাভ করে। সমালোচক নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের মতে ---- *''প্রচলিত বাংলায় অপিনিহিতির-ই-লুপ্ত হয়ে -এ- হয়েছে কিন্তু মানভূমী উপভাষায় অপিনিহিতির -ই- ধ্বনি ক্ষীণ হয়ে অভিশ্রুত এ্যা-কে আশ্রয় করেছে।''* (৮) নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এই বিষয়টিকে 'হ্রস্ব অপিনিহিতি বলে মনে করলেও সুধীরকুমার করণের মতে তা - *''দুটি স্বরধ্বনির মধ্যে যে হ্রস্ব 'ই' ধ্বনি শ্রুত হয় তা আসলে বিপর্যস্ত হ্রস্ব-ই ধ্বনি।''* (৯) এর ফলে ক্রিয়াপদগুলির একটা বিশেষ গঠন দেখা যায়। যেমন - দেখিয়া>দেখে>দেইখে, লড়িয়া>লড়ে>লইড়ে, যাইয়াছিল>গেছিল>গেইলছিল, চলিতে>চলতে>চইলতে ইত্যাদি। যেমন - *''শকে দখে খেপাঁই যাঁয়ে ছট রাণী যাঁয়ে জলে ঝাঁপ দিয়ে ম ইরল।''* (১০)